Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 293–304
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা : মরা মাটি ফুঁড়ে ওঠে জীবনের কায়া

প্রতাপ ব্যাপারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শালবনি সরকারি মহাবিদ্যালয়
ইমেল : pratapbapari@gmail.com

Keyword
দেশভাগ, ভাষা-আন্দোলন, একুশে ফেব্রুয়ারি, মার্কসবাদ, স্বাধিকার আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ।

Abstract
বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে হাসান হাফিজুর রহমান কোনো ব্যক্তিনাম নয়, একটি অধ্যায়। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে একধারায় প্রবাহিত করেছেন তিনি। তিনি একাধারে প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সম্পাদক, সংগঠক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, কূটনীতিক ও গবেষক হলেও সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে তাঁর কবিসত্তা। বর্তমান বাংলাদেশের কবিতার যে সমৃদ্ধময় অগ্রগতি প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার মূল স্থপতি হাসান হাফিজুর রহমান। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলাদেশের সাহিত্য বিশেষত কবিতাকে আত্মমুক্তির স্বার্থেই গণমুক্তির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে কবিতাকে যুক্ত করলেই জীবনের সঙ্গে যুগ্মভাবে সিদ্ধিলাভ ঘটবে সাহিত্যের। ফলে সূচনালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের কবিতা গণচেতনা সম্পৃক্ত হতে পেরেছিল হাসান হাফিজুর রহমানের মতো দীক্ষাগুরুর কারণেই। বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার প্রথম দ্রষ্টা এবং স্রষ্টাও তিনি। তাঁর সম্পাদিত সংকলনগ্রন্থ 'একুশে ফেব্রুয়ারী' স্বাধীন বাংলাদেশের কবিতাকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। আজ সেই পথ রূপান্তরিত রাজপথে, লোকারণ্য এই রাজপথের প্রথম পথিক হাসান হাফিজুর রহমান। অধিকাংশ কবি লেখালেখি শুরু করার অনেক পরে স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করেন। কিন্তু হাসানের ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। প্রথম কাব্য থেকেই তাঁর বক্তব্য এবং বিষয়ে মৌলিকতার আভাস পাওয়া যায়। কারণ রাজনীতি সচেতন কবি সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যম হিসেবেই কবিতাকে বেছে নিয়েছিলেন। সমকালীন বাংলা কবিতার সংকট তাঁর মধ্যে যে আত্মজিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছিল, তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে তিনি সমাজ-সমস্যায় মূলে পৌঁছতে চাইলেন। কবিতাকে স্থাপন করলেন সামাজিক প্রেক্ষাপটে। রাজনৈতিক দ্রষ্টার মতো জীবনের মধ্যে সন্ধান করলেন শিল্পের স্বাদ।

Discussion

বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে হাসান হাফিজুর রহমান কোনো ব্যক্তিনাম নয়, একটি অধ্যায়। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে একধারায় প্রবাহিত করেছেন তিনি। তিনি একাধারে প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সম্পাদক, সংগঠক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, কূটনীতিক ও গবেষক হলেও সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে তাঁর কবিসত্তা। বর্তমান বাংলাদেশের কবিতার যে সমৃদ্ধময় অগ্রগতি প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার মূল স্থপতি হাসান হাফিজুর রহমান। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পরবর্তী সময়ে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে চরম সংকটের মুখে পড়েছিল বাঙালি ও বাংলা সংস্কৃতি। পাকিস্তান সরকার প্রথম থেকেই নিজেদের ধর্মীয় আদর্শে ছিল অবিচল, তাই বিভাগ পরবর্তী সময়ে তাদের কাছে ধর্ম হিসসেবে ইসলাম এবং ভাষা হিসেবে উর্দু গুরুত্ব পারে— এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নতুন দেশ গঠনের উন্মাদনার পূর্ব-বাংলার বাঙালি-মুসলমান সম্প্রদায় এই সংকটকে ততটা গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেননি। সেকারণে নতুন দেশ গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সংঘাতের সূচনা হয়। এই সংঘর্ষের কালে সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছিল বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিসরটি। একেবারে সূচনালগ্নেই বাংলাদেশের সাহিত্যের অভিমুখ কী হবে, কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যকে সতর্কে পাশ কাটিয়ে নতুন দেশের বাংলা সাহিত্যের মুক্তি কোন পথে হবে— এই সব প্রশ্নে বাঙালি যখন দ্বিধাগ্রস্ত, ঠিক তখনই ত্রাতার ভূমিকায় অগ্রসর হলেন তরুণ হাসান হাফিজুর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হাসান পড়াশোনা চলাকালীন ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে। বন্ধু বাহাউদ্দিন চৌধুরীর কাছ থেকে তিনি মার্কসবাদের প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন—

> "তাঁর কাছ থেকে কমিউনিজমের দীক্ষা আমি প্রথম পাই। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে পাকিস্তানের অসাড়ত্ব প্রমাণ করলেন তিনি। এতে আমি পুরোপুরি Convinced হয়ে গেলাম। বাহাউদ্দিনই প্রথম শ্রেণী সংগ্রামের দীক্ষা দেন আমাকে।"[১]

পরবর্তী কালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও আজীবন শোষিত মানুষের সংগ্রামকেই সমর্থন করে গেছেন। কমিউনিজমের সূত্রে তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল সাম্যবাদী জীবনভাবনা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলাদেশের সাহিত্য বিশেষত কবিতাকে আত্মমুক্তির স্বার্থেই গণমুক্তির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে কবিতাকে যুক্ত করলেই জীবনের সঙ্গে যুগ্মভাবে সিদ্ধিলাভ ঘটবে সাহিত্যের। ফলে সূচনালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের কবিতা গণচেতনা সম্পৃক্ত হতে পেরেছিল হাসান হাফিজুর রহমানের মতো দীক্ষাগুরুর কারণেই। বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার প্রথম দ্রষ্টা এবং স্রষ্টাও তিনি। তাঁর সম্পাদিত সংকলনগ্রন্থ 'একুশে ফেব্রুয়ারী' স্বাধীন বাংলাদেশের কবিতাকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। আজ সেই পথ রূপান্তরিত রাজপথে, লোকারণ্য এই রাজপথের প্রথম পথিক হাসান হাফিজুর রহমান।

হাসান হাফিজুর রহমানের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'সওগাত' পত্রিকায়। কবিতাটির নাম ছিল 'শেষ মুহূর্ত-১৩৫৫'। এর এক বছর পর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সঞ্জয় ভট্টচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'যে কোনো সর্বহারার প্রার্থনা'। এই কবিতাটির কারণেই উদীয়মান তরুণ কবি হিসেবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন হাসান হাফিজুর রহমান। এরপর বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় ছাপা হয় হাসানের 'কোনো একজনের মৃত্যুর মুহূর্তে'। ওই একই বছরে কবিতাটি আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খানের সম্পাদিত 'নতুন কবিতা' সংকলনেও প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে কবিতাটি তাঁর 'বিমুখ প্রান্তর' (১৯৬৩) কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। একই বছরে তাঁর দাঙ্গাবিরোধী গল্প 'আরো দুটি মৃত্যু' প্রথমে 'অগত্যা' এবং পরে 'দিলরুবা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত 'দাঙ্গার পাঁচটি গল্প' সংকলন গ্রন্থের প্রকাশও ছিলেন তিনি। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'অস্বস্তি' এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'জরিমানা' নামক ছোটগল্প। রূপকল্পের দিক থেকে আলাদা হলেও উল্লিখিত রচনাকর্মগুলোতে লেখকের বক্তব্য ছিল একমুখী। প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় হাসান শিল্পচর্চা করে গেছেন সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে। একমুহূর্তের জন্যও তিনি সামাজিক দায়িত্ব থেকে সরে আসেননি। এখানেই তিনি আলাদা হতে পেরেছেন তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের থেকে।

অধিকাংশ কবি লেখালেখি শুরু করার অনেক পরে স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করেন। কিন্তু হাসানের ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। প্রথম কাব্য থেকেই তাঁর বক্তব্য এবং বিষয়ে মৌলিকতার আভাস পাওয়া যায়। কারণ রাজনীতি সচেতন কবি সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যম হিসেবেই কবিতাকে বেছে নিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে সাহিত্যচর্চা তো রাষ্ট্রচর্চা, বিজ্ঞান কিংবা নীতিকথা নয়। একথা যেমন সত্য তেমনি এও সত্য যে, সামাজিক চৈতন্যপ্রবাহের একটি অনিবার্য উপাদান হল সাহিত্য। কাজেই সমাজকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চা একটি অলীক কল্পনা। এই সত্যকে সারাজীবন নিষ্ঠাপূর্ণ ভাবে মেনে চলেছেন হাসান হাফিজুর রহমান। কবিতাচর্চায় তাঁর সামনে তখন সমকালের তিনজন কবি দৃষ্টান্তস্বরূপ। একজন অবশ্যই পঞ্চাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমান, অন্য দু'জন হলেন যথাক্রমে আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। শামসুরের কাব্যভাবনার অন্তর্গঠন লক্ষ করলে দেখা যায় তাঁর বেড়ে ওঠার প্রতিবেশ, তাঁর সাহিত্যচর্চায় খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিনি পুরাতন ঢাকার মরচে পড়া নগরের রুক্ষতার মধ্যে, এলোমেলো অসংস্কৃত মানুষের দঙ্গলের মধ্যে কালযাপন করলেও সামাজিক অন্ধকার তাঁর কাব্যে ছায়া ফেলতে পারেনি। কারণ তিনি বেড়ে উঠেছিলেন আধুনিক জীবন ও শিক্ষার ডালপালা ধরে। সেকারণে শামসুর পাশ্চাত্যের আধুনিকতায় প্রণোদিত হয়ে, তিরিশের হলাহল পান করে, চল্লিশের উত্থান-পতন, সমাজ-চেতনাকে আত্মস্থ করে, পঞ্চাশের মোহভঙ্গ ও সংকটকে পাশ কাটিয়ে নিভৃতচারী সাধনায় মগ্ন হতে চাইলেন। আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর উচ্চ-রাজনৈতিক কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন। শ্রেণিচেতনা তাঁর কাব্যেও ছাপ ফেললেও তিরিশের বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যানুশীলন তাঁকে প্রভাবিত করল। অন্যদিকে লোকজীবনকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর 'সাতনরী হার' কাব্যে। এঁরা তিনজনেই কিন্তু মীমাংসাহীন মধ্যবিত্ত দর্শনের রূপকার হয়ে গেলেন। এমনকি এই সময় যে 'নতুন কবিতা' নামক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, বিষয় ও প্রকরণে তা ছিল নতুনত্বহীন। বিভাগ-পরবর্তী সংকটের কথা, বিপন্ন মানুষের জাতিসত্তার কথা কোথাও নেই। বৌদ্ধিক ও ব্যক্তিগত আবেগ-মিশ্রিত কবিতার অর্থহীনতা এবং অসারতা উপলব্ধি করলেন তিনি। এখানেই তিন অগ্রবর্তী কবির থেকে আলাদা হয়ে গেলেন হাসান হাফিজুর রহমান। পঞ্চাশের গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসালেন না, নতুন পথ নির্মাণের ব্রত নিলেন। কবিতাকেই করে তুললেন সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। তাঁর হাতেই বাংলাদেশের কবিতা হয়ে উঠলো গণমানুষের মুক্তির সোপান। প্রেমের পথ ত্যাগ করে বাংলাদেশের কবিতা এগিয়ে গেল প্রতিবাদের পথে। কবিতা মিশে গেল রাজপথের জনারণ্যে।

হাসান হাফিজুর রহমানের কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'বিমুখ প্রান্তর' (১৯৬৩), 'আর্ত শব্দাবলী' (১৯৬৮), 'অন্তিম শরের মতো' (১৯৬৮), 'যখন উদ্যত সঙ্গিন' (১৯৭২), 'বজ্রেচেরা আঁধার আমার' (১৯৭৬), 'শোকার্ত তরবারি' (১৯৮২), 'আমার ভেতরের বাঘ' (১৯৮৩), 'ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী' (১৯৮৩)।

সমকালীন বাংলা কবিতার সংকট তাঁর মধ্যে যে আত্মজিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছিল, তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে তিনি সমাজ-সমস্যায় মূলে পৌঁছতে চাইলেন। কবিতাকে স্থাপন করলেন সামাজিক প্রেক্ষাপটে। রাজনৈতিক দ্রষ্টার মতো জীবনের মধ্যে সন্ধান করলেন শিল্পের স্বাদ। প্রথম কাব্যের নামকরণেই রয়েছে নেতিবাচক জীবনদর্শন। 'বিমুখ প্রান্তর' এখানে প্রতিকূল পরিবেশে প্রত্যাশিত স্বদেশ না পাওয়ার যন্ত্রণা। কাব্যগ্রন্থটির নামকরণে রয়েছে টি.এস. এলিয়টের 'The Waste Land'-এর প্রভাব। এ সম্পর্কে কবির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

> "এলিয়ট আমার মধ্যে খুব impact সৃষ্টি করেছে। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থটির 'বিমুখ প্রান্তর' নামটি আমার ভেতর থেকেই এসেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গেলো The Waste Land-এর সাথে।"[২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাৎক্ষণিক ফল ছিল গণতন্ত্রের প্রসার, কিন্তু তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। মহাযুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যেই ইউরোপের বহুদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন হয় এবং একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে। কার্যত 'গণতন্ত্রের মড়ক' দেখা দেয় সমগ্র বিশ্বজুড়ে। বেকারত্ব, শিল্পক্ষেত্রে সংকট, খাদ্যাভাব, অর্থনৈতিক মন্দা ইউরোপের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অন্তঃসারশূন্য পুঁজিবাদী সভ্যতার এই আস্ফালনে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছিলেন টি.এস.এলিয়ট। তাঁর কাব্যে সম্ভাবনাহীন ইউরোপকে তিনি বন্ধ্যা জমির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই ইউরোপ আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। তরুণ হাসান সময় ও শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের

পরিস্থিতিকে তিনি বিচার করতে চাইলেন দেশভাগ পরবর্তী পাকিস্তানের পূর্ব-অংশের সঙ্গে। অবস্থানগত ভিন্নতা সত্ত্বেও কোথাও যেন মিলে গেল বিশ্বের দুই প্রান্তের সংকট। 'বিমুখ প্রান্তর' কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় যেন সরাসরি The Waste land-এর প্রভাব পড়েছে। যেমন—

ক. "If there were only water amongst the rock
Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit
Here one can neither stand nor lie not sit
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain
There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From doors of mud cracked houses."
(What the Thunder Said)

তুলনীয়,

"কী নরক, কী নরক, ওরে নরকের দাহ
তোর তৃষ্ণা এই বুঝি!
জন্ম-মৃত্যু-খুঁটি-ঘেরা স্বদেশের তাঁবু
আজন্ম মৃত্যুর পথ চেয়ে তাকা!
আমার প্রকৃতি এই, ধুলো-মাটি নেই
নদী-নালাহীন, ছায়ামায়াঘন বনবাতাসের ধ্বনি নেই—
শহরে রাস্তায় পিচে প্রাণহীন লোকালয়
আহা প্রাণহীন লোকালয়।"
(স্মৃতির আগুনে জ্বলে/বিমুখ প্রান্তর)

খ. "The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This Broken jaw of our lost kingdoms
In this last meeting places
We grope together
And avoid speech
Gathered on this beach of the tumid river."
(The Hollow Men)

তুলনীয়,

"কাজ আর কর্মহীনতায়,
হিংসা আর করুণায়
প্রাণান্ত উদ্যম আর ঘাড়-বাঁকানো তরল তুড়ি
কান্নার সাথে ঘাম আর মায়াময় জন্মের ক্লেদ
শ্রম আর অক্লান্ত বিশ্রামে
না জানি কী আছে স্তব্ধতায়।
কী ইচ্ছায় মেঘনার পলিমাটি দেশ দিনেরাতে উন্মুখ

না জানি কী আছে স্তব্ধতায়।"
(স্তব্ধ-মুখ/বিমুখ প্রান্তর)

কোন পরিস্থিতিতে আশাবাদী হাসান হতাশাকে বরণ করে নিতে চাইছেন? এর উত্তর নিহিত আছে দেশভাগ পরবর্তী পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর ভৌগোলিক ব্যবধান। পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান ছিল সহস্র মাইলের। ফলে এই দুই প্রদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন যোগাযোগ সম্ভব হয়নি মূলত এই দূরত্বগত ব্যবধানের জন্য। মৌলিক সম্পদের বিন্যাস এবং মৌলিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য যেমন আয়তন, জনসংখ্যা, শ্রমশক্তি, সেচ, প্রযুক্তি, বাণিজ্য, শিল্প, যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক চাহিদাগত পরিকাঠামোর দিক থেকেও পূর্ব-পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল। **১৯৫১** এবং **১৯৬১** সালের আদমসুমারি থেকে দেখা যায় শুধুমাত্র বাঙালি হওয়ার কারণে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ প্রতিটি সামাজিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার স্বীকার হয়েছে। বাঙালিকে মেধাশূন্য করে দেওয়ার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা করে গেছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এই বঞ্চনার প্রতিবাদ সেভাবে না করলেও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার ক্ষেত্রে বাঙালি কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপে পাকিস্তানের শাসকবর্গের সঙ্গে লড়াই করে গেছে। নবরাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের উপর যে সমস্ত আক্রমণ এসেছিল তার মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত আক্রমণ ছিল অন্যতম। **১৯৪৭**-পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তানের জনজীবনে সরকারি পযার্য়ে বাংলা ভাষার উপর প্রধানত তিন দিক থেকে আক্রমণ আসে। প্রথমত, বাংলা ভাষার মধ্যে উর্দু, আরবি শব্দের প্রবেশ ঘটিয়ে ইসলামিক রূপ ফুটিয়ে তোলা; দ্বিতীয়ত, আরবি ও রোমান হরফে বাংলা লেখা; তৃতীয়ত, বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের জীবন থেকে মুছে দেওয়া এবং পশ্চিম-বাংলার সঙ্গে সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন করা। এছাড়াও ছিল বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করা। পূর্ব-বাংলা ভাষা কমিটি, বাংলা একাডেমি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার সংস্কার সাধনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে। সবমিলিয়ে শুরুতেই চরম সাংস্কৃতিক সংকটের সম্মুখীন হয় পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিরা। তাদের জাতিগত অস্তিত্ব প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছিল। এই ঘটনায় তীব্র আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন কবি—

"স্বনাম ভুলেছি আমি
কৌতুকের পাশব খেলায়
জন্ম মৃত্যু ঘুঁটি চালি
নিতান্ত হেলায়
দিনযাপনের কালে প্রাণধারণের দেশে
বেলা বয়ে যায়"
(বিমুখ প্রান্তর/বিমুখ প্রান্তর)

দির্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, জাতিবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতার নির্লজ্জ প্রকাশ ভেঙে দিয়েছিল বাঙালির অহংকার ও অর্জন। এইসব বিনষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন কবি, নড়বড়ে হয়ে পড়ে তাঁর আজন্মলালিত বিশ্বাস। স্বৈরতন্ত্রের কদর্যতা শুষে নিতে চায় কবির সব মঙ্গল, কল্যাণ, শাশ্বত চেতনা। কবি নিঃস্ব হতে হতে পরিণত হন 'ফাঁপা মানুষ'-এ। এলিয়ট যেন ভর করে কবির চেতনায়। নৈরাজ্যের কোলাহলে সমগ্র দেশ মগ্ন। কোনো আশা নেই, নেই সুস্থির ভাবনা। বেদনার ক্লেদ যেন কান্না হয়ে ঝরে পড়ে, রাষ্ট্রিক বন্ধনে বন্দি কবি-আত্মা যেন আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু কবিরা তো তিমিরবিলাসী নন, তিমিরবিনাশী। কবিকে টিকে থাকতে হয় বিপর্যয়ে, হাহাকারে, পতনে, পরাজয়ে। ধ্বংসের বিপ্রতীপে নব সৃষ্টির প্রত্যক্ষদর্শী একমাত্র কবিই। কবি সৎ এবং স্বাধীন। কবির অভিযাত্রা বিষণ্ণলোক পেরিয়ে উজ্জল সূর্যের অনুভবে। সব কবিরই প্রভাত কালে কুয়াশা থাকে, ঘোর থাকে, থাকে প্রদোষ কালের প্রহার, আবৃত আচ্ছন্নতা। কবির বিকাশ হয় চন্দ্রকলার মতো। একসময় মেঘদূতের মতো সে দেখে নেয় সমাজ-সংসার-দেশ-মহাদেশ। ঘুম ভাঙা পাখির ডাকে ডেকে আনে আলোর প্রহর, সহজ হয়ে যায় জীবনের অভিসার। চেতনার তটে জেগে ওঠে আশার আলো। এই

কাব্যের একাধিক কবিতায় লক্ষ করা যায়, দুঃসময়ের অন্ধকারকে অতিক্রম করে আলোয় ফেরার ক্ষেত্রে কবি প্রবল আত্মবিশ্বাসী। তাঁর এই আত্মবিশ্বাস তাঁকে করে তুলেছে আশাবাদী—

"প্রশাসন শানিত প্রতাপে শঙ্কিতের ভীতি নয়— আমার প্রাণের
অবিরাম দুঃখের ক্ষরিত এই স্রোত তোমাকে দিলাম।
নিরঙ্কুশ স্বাধিকারে ও অবারিত সম্মানে ফেরবার,
অনাহত সত্যে ও স্বাতন্ত্র্যে ফেরবার আকাঙ্ক্ষা-উন্মুখ এই ফুল
দুঃস্বপ্নের কালে, দুঃশাসনের দৃষ্টির তলে, রক্তজবা এই ফুল তোমাকেই
দিলাম, দিলাম তুলে।"

(রক্তিম হৃদয়ফুল/বিমুখ প্রান্তর)

শিল্প-সাহিত্যের নানা শাখায় মিথ-পুরাণের প্রতি কবি-সাহিত্যিকদের মুগ্ধতা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে কবিতায় মিথের যথাযথ প্রয়োগ কাব্যভাষায় আনে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা। একই সমান্তরালে কবিতার নিহিতার্থ এবং উদ্দিষ্ট বিষয় মিথ প্রয়োগের নৈপুণ্যে আরো বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে। সমকালীন ঘটনা যখন সংবেদনশীল কবিমানসকে বিপর্যস্ত করে, তখন কবি হয়ে ওঠেন প্রতিবাদী ও সোচ্চার। এই প্রতিবাদ মানুষের মনকে আন্দোলিত করে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে মত প্রকাশের পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যায় তখন কবি মিথাশ্রয়ী হয়ে পড়েন। মিথিকাল কোনো ঘটনা কিংবা চরিত্র কবিতার উপমা, চিত্রকল্প বা প্রতীকের আশ্রয়ে প্রকাশ পায়। 'বিমুখ প্রান্তর' কাব্যে মিথ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও হাসান হাফিজুর রহমানের নিজস্বতা লক্ষণীয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথের সার্থক প্রয়োগ তাঁর কবিকে আশ্চর্যরকম সফল করে তুলেছে। এই কাব্যের একাধিক কবিতায় মিথের অনুষঙ্গ এসেছে বক্তব্যের অবলম্বন হয়ে—

ক. "আমার দুই হাত কেবলই নূহের কাসেদ কবুতরের মতো
আকাশকে ডাকে, সে ঘোষণা আকাশে আকাশে সেই দিকে মুখ।"

(স্তব্ধ-মুখ/বিমুখ প্রান্তর)

খ. "এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ কটি বছরের
ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি"

(অমর একুশে/বিমুখ প্রান্তর)

গ. "হারিয়ে সূতো থেসিউসের
দুর্ভাবনার মতো
জানবো না পথ-ফেরার...
দিনের আলো কুহক হয়ে আসে
দিনেরই অভিশাপে।"

(গোলক ধাঁধা/বিমুখ প্রান্তর)

ঘ. "মৃত ধমণীতে রক্তে ডাকে বাণ
দ্রৌপদীর শাড়ির মতন আয়ু বেড়ে চলে
অন্ধ ঢলে বয়ে যায় কাল
সময়ের দাঁতে উদ্বন্ধনে আমি ঝুলে আছি
ঝুলে আছি আহা ঝুলে আছি।"

(স্মৃতির আগুনে জ্বলে/বিমুখ প্রান্তর)

ঙ. "ভয় নেই, মন্ত্রপূত ওই প্রাণবায়ু জাবে না কখনো উড়ে দধীচির
ওই দেহ ছেড়ে;
অনেক পুরাতে হবে আশা, সভ্যতার দেশকালমাতৃকার,
রয়েছে অনেক আরো আত্মকৃতকর্ণধার,
এখনো অনেক দায় শোধবার বাকি;"

(রক্তিম হৃদয়ফুল/বিমুখ প্রান্তর)

'আর্ত শব্দাবলী' কাব্যের কবিতাগুলি ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত। সেকারণে বিষয় ও প্রকরণে এই কাব্যের কবিতাগুলি 'বিমুখ প্রান্তর'-এর সমধর্মী। কিন্তু একই সময় কালে রচিত হলেও পূর্ববর্তী কাব্যের গতানুগতিক ভাবনা এখানে পরিণতি পেয়েছে অনেকটাই। এই ঋদ্ধতাই এই কাব্যের কবিতাগুলিকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। মিথকে অবলম্বন করে কবি সমকালের সঙ্গে মহাকালের সেতুবন্ধনে প্রয়াসী হয়েছেন। কাব্যের প্রথম কবিতাতেই গ্রীক পুরাণের নবনির্মাণ ঘটালেন কবি। কবিতাটি একটি রূপক কবিতা। কাহিনিতে দেখা যায় দেবী ক্যালিপসোর প্রণয়ের বেড়াজালে দীর্ঘদিন বন্দি থাকার পর ওডেসিস মুক্তিলাভ করে স্বদেশের পথে পাড়ি দেয়, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তার যাত্রাপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে পুনরায় এক নারীর রূপজ মোহে আটকা পড়ে। এই পরিস্থিতিকে কবিকে পূর্ব-বাংলার ঘটমান পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। ক্যালিপসোর প্রণয়ের মতো পাকিস্তানের পরিকল্পিত স্বৈরশাসন দীর্ঘদিন বাঙালিকে পাকিস্তানের ইসলামীয় জাতীয়তাবাদী আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করতে বদ্ধ পরিকর ছিল। কিন্তু ওডেসিউসের মতো বাঙালি ধর্মের মোহ ত্যাগ করে স্বীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে ভাষা-আন্দোলনের মতো রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদ মাধ্যমকে বেছে নিয়েছিল। এরপর তার যাত্রা যখন স্বীয় সংস্কৃতিভিত্তিক স্বদেশ গঠনের স্বপ্নে উন্মুখ, ঠিক তখনই ফ্যায়াসিয়ান রাজকুমারী ন্যসিকার মতো সামরিক শাসনের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে বাঙালি। আসলে যখনই বাঙালি তার কাঙ্ক্ষিত স্বদেশ লাভের স্বপ্ন দেখেছে তখনই রাজনৈতিক প্রতিকূলতা স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে হাজির হয়েছে। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে, লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য কবির সুতীব্র আহ্বান—

> "অনন্ত-আয়ু ক্যালিপসোর উর্বশী যৌবন নয়,
> ন্যসিকার উন্মোচিত শ্বেত বাহুর লোভও নয়,
> সারা জীবনের তৃষ্ণার্ত বিহঙ্গ অন্বেষণে
> গভীর গাছের মতো নারীকেই চেয়েছিলে তুমি
> তাহলে, নাবিক? অধীর উঠাও অস্থির স্বাপ্নিক?"
>
> (ওডেসিউসের চোখে ন্যসিকা: আমার মনে/আর্ত শব্দাবলী)

এর মধ্যে দিয়ে কবি পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিকামী মানুষের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। এতকিছুর পরেও কবির কাছে তাঁর জন্মভূমি একমাত্র সত্য। তাই আমৃত্যু মাতৃভূমির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কবি জানালেন—

> "আমার হৃৎপিণ্ডের মতো
> আমার সত্তার মতো
> আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রীর মতো
> সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ
> আমার দেহের আনন্দ কান্নায় তোমাতেই আমি সমর্পিত"
>
> (অনন্য স্বদেশ/ আর্ত শব্দাবলী)

সমাজ সচেতন কবির মধ্যে কখনো জেগে ওঠে স্বদেশ হারানোর আর্তনাদ, অস্তিত্বের সংকটে ভুগতে শুরু করে কবিসত্তা। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের জীবনে অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা হয়। তৎকালীন মেজর জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার নিয়ে এই অধ্যায়ের সূত্রপাত। রাজনৈতিক ঘটনা সরাসরি আঘাত আনে বাঙালির সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রভূমিতে। সাংস্কৃতিক অপচেষ্টার প্রয়াসস্বরূপ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে জন্মশতবার্ষিকীতে পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন, পরবর্তীকালে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের 'ছয় দফা' আন্দোলন বাঙালির আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামকে নির্দিষ্ট আকার দান করতে শুরু করে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের স্বাধিকার আন্দোলন দ্রুততার সঙ্গে মাত্র তিন বছরের মধ্যে গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রাক-মুহূর্তের প্রস্তুতি যুদ্ধ। এই সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক জটিলতা বাঙালি জীবনকে যে সংকটের মুখে ফেলেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে কোনো ধর্মীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে কাব্যচর্চা সম্ভব হয়নি। বরং সমকালীন সংকট, সংগ্রাম ও মূল্যবোধকেই এই সময়ের কবিরা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের এই পর্বের কবিতা ধর্মের আবরণ খসিয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছে যেখানে গণমুখী জীবনবোধ প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। হাসান

হাফিজুর রহমানের 'অন্তিম শরের মতো' কাব্যের কবিতাগুলিতে সমকালীন জীবন ও সমাজচৈতন্যের যন্ত্রণাকাতর স্পন্দন অনুভব করা যায়—

"কাজল আঁধার রাতে বেনোজলে চাঁদ গেছে ভেসে
আম জাম কাঁঠালের আকুলিত পাতা ভয়ানক ত্রাসে
দক্ষিণা ঝড়ের সাথে বুঝেছে বিদ্রোহে সারারাত ধরে,
উটের পিঠের মতো সমুদ্রের তরঙ্গ অশেষ
ফুঁসে ফুঁসে উঠে এসে
ডুবিয়েছে ঘরবাড়ি জনপদ
মাঠ ঘাট প্রান্তর নগর, ফসলের স্বপ্নভরা ক্ষেত।"

(বিপদে বিপন্ন নও/অন্তিম শরের মতো)

কবিতাংশটিতে জীবনানন্দের প্রভাব স্পষ্ট। অনুভূতিহীন সমাজব্যবস্থায় সংবেদনশীল কবি যখন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না, তখন নেতিবাচক চিন্তার অরণ্যে দিশেহারা হয় কবিসত্তা, পরাবাস্তব ভাবনা ভিড় করে কবির চেতনায়। হাসান হাফিজুর রহমানের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। এই কাব্য রচনার সময়কালে কবি আর্থ-সামাজিকভাবে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালে কবি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। এইসময় অধ্যক্ষের শিক্ষক-স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করায় তিনি চাকুরিচ্যুত হন। এরফলে তাঁর জীবনে যে সংকট নেমে আসে সে সম্পর্কে কবি বলেছেন—

"জগন্নাথ কলেজ terminate করে যখন, তখন প্রায় নয় মাস বেতনহীন, চাকুরিহীন জীবনযাপন করি ১৯৬৪ সালে। ডিসেম্বর মাসে পুনরায় চাকুরিতে যোগদান করি আমি। আমার পারিবারিক জীবনে ওই সময়টা অ্যাফেক্ট করেছিল প্রবলভাবে।"[৩]

পরবর্তী কালে হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর চাকুরী ফিরে পেলেও ইস্তফা দেন। কারণ আজীবন তিনি অন্যায়, অনিয়ম, অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ তাঁকে এই চাকুরি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল।

'যখন উদ্যত সঙ্গিন' কাব্যের কবিতাগুলো মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। নয়মাসের জীবনযুদ্ধে বাঙালি স্বৈরশাসনের অন্ধকারকে চিরদিনের মতো বিদায় জানিয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের জীবনে ১৯৪৭-এর দেশভাগ ছিল সবচেয়ে বড়ো বিপর্যয়। এই বিপর্যয়কে কাটিয়ে ওঠার জন্য তারা একের পর এক আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তাই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী সময়ে ইতিহাসের পরিবর্তনের ধারায় বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির স্বাধিকার আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির আত্মপরিচয়কে প্রকাশ করেছিল, অনুপ্রেরণা দিয়েছিল নতুন সমাজ নির্মাণে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতি যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বৃহত্তর সমাজ নিমার্ণের পথে এগিয়ে গিয়েছিল সেই পথ নির্দেশনায় জাতীয় সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করেই পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সাহিত্য বিশেষত কবিতায় সঞ্চারিত হয়েছে নতুন ভাবনা ও মূল্যবোধ। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন এক একজন শব্দযোদ্ধা। সমকালীন সময়ের বেদনা-বিক্ষোভ-উত্তাপকে ধারণ করে বাংলাদেশের কবিরা কবিতাকে একটি নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময়ের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা, নির্মম অত্যাচার, লুণ্ঠনের পাশাপাশি শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ, সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবগাথা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি নতুন স্বদেশ লাভের আশা আকাঙ্ক্ষাও বর্ণিত হয়েছে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যা করেছিল কারণ তারা শিক্ষায় এগিয়ে থাকা পূর্ব-পাকিস্তানকে মেধাশূন্য করতে চেয়েছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ধরে বাংলাদেশে যে হত্যাযজ্ঞ চলেছিল তার অন্যতম শিকারে পরিণত করা হয় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের। ২৫ মার্চের রাত্রিতে যে কয়েকজন বুদ্ধিজীবীদের উপর আক্রমণ চালানো হয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। ১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত মুনীর চৌধুরী ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম সমালোচিত ব্যক্তিত্ব। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনসহ পরবর্তী আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় শিক্ষক হওয়ার দরুণ তির্যক বাকভঙ্গি,

মার্জিত রুচিবোধ, সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা— সমস্ত বৈশিষ্ট্যই একীভূত হয়েছিল মুনীর চৌধুরীর মধ্যে। স্বাধীনতা পাওয়ার দিনেই তাঁর মতো সুবক্তাকে হারিয়েছিল বাংলাদেশের মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত হাসান বলেন—

"আমার বুকের ভেতর এখন কেবল হাহাকার
এবং হৃৎপিণ্ড যেন এক
প্রবল পালকপোড়া পাখি, থেকে থেকে
শুধুই নির্মম চিৎকারে ওঠে ডেকে
মুনীর মুনীর"

(স্মৃতি/শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে কবিতাগুচ্ছ)

কেবল বুদ্ধিজীবী হত্যা নয়, ধর্ষণের মতো কলঙ্কিত ঘটনার সাক্ষী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা হাসান। **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী সদস্যরা লক্ষাধিক বাঙালি নারীকে ধর্ষণ করেছিল। মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিম এবং সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দু উভয় সম্প্রদায়কে ভীত সন্ত্রস্ত্র করে তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই নারকীয় কাণ্ড চালানো হয়েছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানি সেনাদের শিবির হয়ে উঠেছিল বাঙালি নারীদের বন্দি শিবির। তাদের ওপর ঘটে যাওয়া কলঙ্কিত ইতিহাসের কথা উঠে এসেছে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায়। যেখানে ধর্ষিতা নারী পেয়েছে বীরাঙ্গনা সম্মান—

"তোমাদের ঠোঁটে দানবের থুথু
স্তনে নখরের দাগ, সর্বাগ্রে দাঁতালের ক্ষতচিহ্ন প্রাণান্ত গ্লানিকর।
লুণ্ঠ হয়ে গেছে তোমাদের নারীত্বের মহার্ঘ্য মসজিদ।
উচ্ছিষ্টের দগদগে লাঞ্ছনা তোমরা
পরিত্যক্ত পড়ে আছ জীবনের ধিকৃত অলিন্দে নাকচ তাড়িত।....
লাঞ্ছনার বেদীমূলে তোমরা সবাই
একেকটি জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন হয়ে গেছো আজ,
সংগ্রামের খর প্রাণকণা অনশ্বর বীরাঙ্গনা।"

(বীরাঙ্গনা/যখন উদ্যত সঙ্গিন)

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ কোনো সাধারণ যুদ্ধ ছিল না। এটা ছিল একটি গণযুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, কৃষক-শ্রমিক, সরকারি-বেসরকারি কর্মচারি, সৈনিক, ছাত্র-শিক্ষক, ধনী-দরিদ্র সমস্ত শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার কোনো নির্দিষ্ট শর্ত ছিল না। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ পরাধীনতার জ্বালা মেটাতে নিঃস্বার্থভাবে এই জনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। এর মধ্যে প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসাবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাকি সাড়ে ছয় কোটি মানুষ দেশের অভ্যন্তরে প্রতিমুহূর্তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করেছেন, প্রতিটি দুঃস্বপ্নের রাত অতিক্রম করে পাকিস্তানি ঘাতকবাহিনীর মোকাবিলা করেছেন। ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়েও অবরুদ্ধ ছয় কোটি মানুষ নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মুক্তিযোদ্ধাদের সব রকমের সাহায্য করেছেন। এই অবরুদ্ধ সময়ে মানুষের কাছে নিজগৃহ হয়ে উঠেছিল বন্দি শিবির, এর থেকে বাদ যাননি সে-দেশের কবিরাও। প্রতি মুহূর্তে তাঁরা ঘাতকের হাতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছেন। বাক্‌রুদ্ধ দিনগুলিতে নিজেদের নিশ্বাসের শব্দকে মানুষ গোপন করতে চেয়েছেন। মানুষের বেঁচে থাকার সেই প্রবল আর্তি ফুটে উঠেছে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায়—

"বাইরে আঁধারে যেন কোন ভয়ানক
অশরীরী হয়ে গেছে আজকাল....
দূরে কিংবা আশেপাশে কখনো খুবই কাছে
যাচ্ছে শোনা ফুটফাট গুলির আওয়াজ, ত্রাসে
বুক কাঁপে, পারি না শুধোতে কে কোথায় গেল মরে,
দম বন্ধ করে চুপ পড়ে থাকি ঘরের কবরে। মৃত্যু

এখনো আসেনি বটে, তবে অবারিত মৃত্যুর নিশানা
হয়ে আছি আমরা সবাই।....
লুকোই শ্বাসেরও শব্দ যদি ভুল ভেবে কবর পেরিয়ে যায় কোনোমতে
হয়তো বাঁচতে পারি কয়েকটা আকুল মুহূর্ত আরো।"

(লুকোই শ্বাসেরও শব্দ/যখন উদ্যত সঙ্গিন)

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কবি হাসান হাফিজুর রহমান সশরীরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই একাত্তরের নয় মাসের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতায় শিল্পিত রূপ পেয়েছে। বাংলা বর্ণমালার মধ্যে কবি বাঙালি জাতির পরিচয় খুঁজতে চেয়েছেন। তাই বর্ণমালার আদি অক্ষর 'অ'-এর মধ্যেই কবি সভ্যতার প্রতিচ্ছবি লক্ষ করেছেন। পূর্ব প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার একটাই উপায় হল ভাষা-সংস্কৃতি। কবি মনে করেন আদিম অক্ষর রাশি অ আ ক খ কবিকে পূর্বজন্মের সঙ্গে একসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। নিরাপরাধ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের উপর পাকিস্তানি ঘাতকবাহিনীর অত্যাচার কবিকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। কবির স্মৃতিতে ফিরে এসেছে একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতি। তাই কবিও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়ে শপথের ডাক দিয়েছেন—

"নিহত ভায়ের লাশ কাঁধে বয়ে ঢের
গড়েছি মিনার, হেঁটে গেছি পথ।
আর নয়, চাই শত্রুর লাশ চাই,
-এইবার এই বজ্র শপথ।"

(শত্রুর লাশ চাই/যখন উদ্যত সঙ্গিন)

একাত্তরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মূল লক্ষ্যই ছিল পূর্ব-পাকিস্তানকে, পাকিস্তান থেকে পৃথক করে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে 'বাংলাদেশ' গঠন করা। আগেই বলা হয়েছে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি ঘাতকবাহিনীর আক্রমণের পর আনুষ্ঠানিক মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলেও স্বাধীনতার বীজমন্ত্র বাঙালির মনে গেঁথে দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের মার্চ মাসে। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন— 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সে-দিনের সভায় উপস্থিত বাঙালির কাছে এই ঘোষণা মন্ত্রের মতো ধ্বনিত হয়েছিল। নতুন দেশ পাওয়ার থেকে বড়ো হয়ে উঠেছিল স্বাধীন দেশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনগণের যুদ্ধ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এই জনগণই পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন নিজেদের স্বাধীন করতে। কিন্তু স্বাধীনতা আনতে গিয়ে অনেক রক্ত ঝরিয়েছে বাঙালি। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজপথে, গৃহে রয়েছে সেই শোকের চিহ্ন। কিন্তু শোকে ম্যুহমান হয়ে থাকলে স্বাধীনতাকে আনা সম্ভব হবে না। তার জন্য দরকার দৃঢ় মনোবল। আপন প্রাণশক্তিকে যথার্থভাবে জাগিয়ে তুললেই কাম্য স্বাধীনতা আসবে বলেই বিশ্বাস করেন হাসান হাফিজুর রহমান। তাই জনগণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য শোককে তিনি রূপান্তরিত করেছেন ক্রোধে। মুক্তিই কবির একমাত্র কাম্য। এর জন্যে কবি যেকোনো ধ্বংসাত্মক কাজে প্রস্তুত। কবিতায় সেই মনোভাবের কথা ফুটে উঠেছে—

"আমার নিশ্বাসের নাম স্বাধীনতা
আমার বিশ্বাসের নখর এখন ক্রোধের দারুণ রঙে রাঙানো,
দুঃস্বপ্নের কোলবন্দী আমার ভালোবাসা
এখন কেবলই
এক অহরহ চিৎকার : হত্যা কর, হত্যা কর, হত্যা কর।
বাংলার গর্জমান বাতাসে এখন আর কিছু বোঝে না।
এখন সকল শব্দের একটিই মাত্র আওয়াজ : অবিনাশী হুঙ্কার।"

(এখন সকল শব্দই/যখন উদ্যত সঙ্গিন)

'বজ্রে চেরা আঁধার আমার' 'শোকার্ত তরবারি', 'আমার ভেতরের বাঘ', 'ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী' কাব্যগ্রন্থগুলো ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সময়কালের দিক থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের সবচেয়ে সংকটময় পর্ব ছিল এটা। ক্ষমতার বসলেও ভেঙে পড়া আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে রাতারাতি উন্নত করে তোলা সম্ভব হয়নি মুজিবুর রহমানের পক্ষে। একইসঙ্গে ছিল প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা এবং দলীয় দুর্নীতি। ফলে দেশের জনগণের ক্ষোভের সুযোগ নিয়ে

বাংলাদেশে সুবিধাবাদীগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ বিশেষ করে সেনাবাহিনী, রাষ্ট্রযন্ত্রকে কুক্ষীগত করা শুরু করে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট সপরিবারে নিহত হন শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা চলে যায় সেনাবাহিনীর হাতে। সাতের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে পুরো আটের দশক জুড়েই সামরিক শাসনের যাঁতাকলে পৃষ্ট হয়েছিল বাংলাদেশের জনগণ। গণতন্ত্রের এই বিনাশ দেশের মানুষের মনে যে গভীর শূন্যতা ও স্বপ্নভঙ্গ তৈরি করেছিল তার থেকে বাদ যায়নি সে-দেশের কবিতাও। ফলে দীর্ঘ এই দুই দশকে বাংলাদেশের কবিরা যে-সমস্ত কবিতার রচনা করেছেন তার একটা বড়ো অংশ জুড়েই রয়েছে স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান। স্বাধীনতা-উত্তর প্রশাসনিক অস্থিরতা বাংলাদেশের মানুষকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। এই বিদ্রোহের আঁচ পাওয়া যায় হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায়—

> "আজকাল এমন সরস শ্যামলিমা কোথাও পাই না খুঁজে
> যেদিকে ফেরাই চোখ বারুদের মতো খরতপ্ত মানুষেরা
> গনগন করে। সমস্ত বাংলাই বুঝি
> গরম বারুদ হয়ে গেছে ফের।"
>
> (বারুদ/বজ্রে চেরা আঁধার আমার)

'শোকার্ত তরবারি' কাব্যের কবিতাগুলি হাসানের বেদনাঘন ব্যক্তিক অনুভূতির পরিচায়ক। এই দুঃখবোধ তাঁকে নিরাসক্ত করেছে তুলেছে জগৎ ও জীবনের প্রতি। আশা-নৈরাশ্যের দোলাচলতায় অস্থির হয়ে উঠেছেন কবি। গুমোট ঘরে বন্দি কবি, ঠোঁটে নেই জীবনের মধু, রয়েছে কেবলই ঘর্মাক্ত স্বেদবিন্দু, জ্যোতিহীন চোখে কেবলই বঞ্চনা, হৃদয়ে একরাশ শূন্যতা। কবির চেতনসত্তা যেন এক অস্থির যন্ত্রণায় পেঁচিয়ে উঠতে থাকে, মুখমণ্ডল বিধ্বস্ত হয় কদাকার বন্ধ্যা বলিরেখায়। কিন্তু কবি আশাবাদী, তিনি জানেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে রয়েছে প্রভাতের রৌদ্র কিরণ। তাই মাতাল হাওয়ায় মত্ত কবিসত্তা চোখ ফেরান জীবনের দিকে—

> "স্থূল স্থূল পর্দা ভেদ করে জোছনা আসবে,
> দেখবে কামুকতার পরম কোলে বড্ড নন্দিত
> প্রবল পুরুষ তুমি শুয়ে আছো,
> তোমার দুহাত পচনশূন্য, দুটি-স্বচ্ছ ফল,
> ছায়াচ্ছন্ন রাজপথ থেকে দ্বৈরথের তূর্যধ্বনি উঠছে
> যে রণে মৃত্যু অমৃতের অধিক,
> উত্থিত আনন্দে তুমি আপ্লুত ভিজে যাবে
> তোমার কিছুই হারায়নি, লোলচর্মে নড়বড়ে অস্তিত্বে সবই আছে,
> শুধু ডাক দিও।"
>
> (শুধু ডাক দিও/শোকার্ত তরবারি)

আধুনিকতার সংকট থেকে সচেতন উচ্চারণ হাসানের কবিতা, যদিও সেই উচ্চারণে আবেগের ফেনিলতা নয় রয়েছে বাস্তবনিষ্ঠতা। একাকিত্ব তাঁর নিত্যসঙ্গী বলেই তিনি ব্যক্তিগত নন্দিত ধারণাকে নিয়েই চলতে চান। আধুনিক সভ্যতার প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং তাকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়েই একজন কবি একাকী হয়ে পড়েন। চলমান সমাজ-জীবনের পঙ্কিলময় প্রবাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে কবি ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নেন সমাজ-সংসার থেকে, হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ। হাসানের কবিতা এই একাকী উচ্চারণে পূর্ণ—

> "আমার নিভৃত ভাঙে রথের চাকার স্বর
> সিংহাসন ঘিরে থাকা একমুঠি চতুর মানুষ, অহর্নিশ
> ফসলের কারচুপি, কেবলি অক্ষম ক্ষুধার্তের বংশবৃদ্ধি,
> নিছক নিজেরি কোলে ঝোল টানা প্রচারের অসহ্য নিনাদ, ক্ষান্তিহীন।
> এই তো আমার ক্ষয়, আমার নিঃশ্বাস টানে প্রতিবার,
> এরই মধ্যে খুঁদকুঁড়ো খুঁটি যতক্ষণ বাঁচি, দেখি প্রতাপের
> দূরায়ত অবলীলা, চিরায়ু, সুস্থির,

তেলে জলে কখনো মিশে না।"

(অনাদি অরণ্য যেন/আমার ভেতরের বাঘ)

আধুনিক জীবন-যন্ত্রণায় কাতর কবি হৃদয়ের রক্তক্ষরণে ক্রমাগত শানিত এবং রক্তাক্ত হচ্ছেন, তাঁর স্নায়ু-শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে ভোগবাদী সভ্যতার প্রতি একরাশ ঘৃণা-লাঞ্ছনা। আত্মমগ্ন কবি নিজেকেই প্রশ্নের বাণে জর্জরিত করেন। এই জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিক ও সামাজিক সংকটকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেন। ঘুণ ধরা সমাজের অবক্ষয়কে অতিক্রম করে তিনি আশাবাদী তাঁর বাণিজ্যতরী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকেই এগিয়ে যাবে। কিন্তু যাত্রাপথ কণ্টকাকীর্ণ। অগ্রগমনের প্রতি মুহূর্তে বাধাপ্রাপ্ত কবি সিদ্ধান্তে আসেন—

"লোকালয় আমার প্রধান শত্রু!
সভ্যতা আমার প্রধান শত্রু!
রুচি আমার প্রধান শত্রু!"

এই তিনশত্রুর বিরুদ্ধে কবির সাবধানবাণী—

"পারলে পোশাক ফুঁড়ে আমার অজস্র আদিমতা
এখুনি ঐ শত্রুসমূহের টুঁটি তাক করে,
রোমে রোমে গরর গরর আওয়াজের পাশবতা..."

(অজস্র আদিমতা/ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী)

আধুনিক পৃথিবীর যে জটিল সামাজিক চক্রব্যূহে আমাদের নিত্যবাস, প্রতিমুহূর্তের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়ের সংঘাতে জটিল বুদ্ধির জন্ম হচ্ছে আমাদের ভেতরে। এই বুদ্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে বৃহত্তর সমাজের পটভূমিতে রেখে সার্বিক মূল্যায়ন করা। নিজের অস্তিত্বের পটভূমিকে সামগ্রিকভাবে আবিষ্কার করতেই চেয়েছেন হাসান হাফিজুর রহমান। তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সত্তার সন্ধান। তিনি লিখে লিখেই সমাজের প্রতি দায়িত্বপালন করতে চেয়েছেন, নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন। জীবন সায়াহ্নে কবি মৃত্যু চেতনায় আক্রান্ত। রোগজর্জর দেহ, মানসিক ক্লান্তি যেন ততোধিক যন্ত্রণাময় হয়ে উঠেছে সামরিক শাসনে জীর্ণ বাংলাদেশে। কবি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে না চাইলেও প্রতিনিয়ত অনুভব করছেন মৃত্যুর গন্ধ, অশরীরী হয়ে আত্মগোপন করতে চাইছেন। মৃত্যুর ভয়ে নয়, পৃথিবীর স্নেহ-সম্বোধন-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হতে চান না কবি; তাই এই আত্মগোপন। কিন্তু সত্যকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না, কালের নিয়মে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেই হবে। তাই অপ্রকৃতিস্থিতের মতো দ্রুততার সঙ্গেই নিজের সব সাধ পূর্ণ করার বাসনায় কবি অস্থির। সেজন্য শেষবারের মতো জীবনদেবতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথোপকথনে মেতে ওঠেন তিনি—

"হাসান, এত তাড়া কিসের?
পরম গুরু যুগযুগান্তে ফোটায় মুকুল,
তার তো তাড়াহুড়ো নাই?
বললাম হেসে, তাঁর হাতে আছে যুগযুগান্ত,
আমার যে মোটেই সময় নাই।।"

(২৪ সংখ্যক কবিতা/অপ্রকাশিত কবিতা)

তথ্যসূত্র :

১. রফিকউল্লাহ খান, 'হাসান হাফিজুর রহমান: জীবন ও সাহিত্য', বাংলাপ্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম বাংলাপ্রকাশ সংস্করণ একুশে বইমেলা ২০১৬, পৃ. ৩১
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

আকর গ্রন্থপঞ্জি :

১. হাসান হাফিজুর রহমান, 'কাব্যসমগ্র', সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০০১